SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

চতুর্বর্গ পুরুষার্থ: একটি সংক্ষিপ্ত কথন

Rubai Kundu
Research Scholar, Jadavpur University
Jadavpur, West Bengal, India
Email: rubaikundu96@gmail.com

Abstract: পুরুষের যা প্রার্থিত, তাই পুরুষার্থ। পুরুষের প্রার্থিত বস্তুকে ভারতীয় দর্শনে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থ। আদিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তী সময়ে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ ত্রিবর্গের সাথে যুক্ত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থকে একত্রে চতুর্বর্গ বলা হয়। এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থ স্বীকারের মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে বৈদিক জীবন জিজ্ঞাসার মূল বাণী। পারস্পরিক এক নিবিড় সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে গ্রথিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ ধারণা হিন্দু জীবনদর্শনের পরিচায়ক। এই প্রবন্ধে আমার সীমিত ধীশক্তির দ্বারা চতুর্বর্গ পুরুষার্থ বিষয়ে একটি দার্শনিক পর্যালোচনা করার প্রয়াস করেছি।

Keywords: পুরুষার্থ, মোক্ষ, অবিনশ্বর, স্বতঃমূল্যবান, নির্বাণ।

পুরুষের যা প্রার্থিত, তাই পুরুষার্থ। এখানে 'পুরুষ' শব্দের অর্থ প্রতিটি মানুষ, পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে এক সত্তা। শাস্ত্র মতে, 'পুরী শেতে' ইতি পুরুষ।[1] অর্থাৎ দেহরূপ পুরীতে যিনি সদা শুয়ে আছেন তিনিই পুরুষ। যে সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় আত্মা স্বীকার করেন তারা মনে করেন জীবাত্মাই হল পুরুষ। পুরুষের প্রার্থিত বস্তুকে ভারতীয় দর্শনে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থ। পুরুষার্থের সাধনকেও পুরুষার্থ বলা হয়ে থাকে। কারণ সাধনের মাধ্যমেই প্রার্থিত বিষয় পাওয়া যায়।

পুরুষার্থ বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে বৈদিক ধর্মনীতির মধ্যে মানুষের সদর্থক জীবনবোধ ও আধ্যাত্মিকতার যে মেলবন্ধন সাধিত হয় তার প্রকৃত পরিস্ফুটন হয়। বৈদিক ভারতীয় দর্শনে মানুষের দুটি সত্তা স্বীকার করা হয়। যথা– ১) আধ্যাত্মিক অবিনশ্বরতার দিক ও ২) নশ্বর জীবনের প্রয়োজন ও প্রয়াস। আধ্যাত্মিক ও অবিনশ্বরতার দিক হল মোক্ষ, যা পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকৃত এবং জীবনের সত্য রূপের উৎঘাটিত দশা। অন্যদিকে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ হল নশ্বর জীবনের প্রয়োজন ও প্রয়াস। অনেক শাস্ত্রবিদের মতে আদিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থের অন্তর্গত ছিল। কিছু কিছু প্রাচীন রচনায় এই ত্রিবর্গকেই পুরুষার্থরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ ত্রিবর্গের সাথে যুক্ত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ– এই চারটি পুরুষার্থকে একত্রে চতুর্বর্গ বলা হয়।

ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ বিষয়ে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন— চার্বাক দর্শনে কামকে মুখ্য পুরুষার্থ বলা হয় এবং অর্থকে কাম চরিতার্থ করার উপায় মাত্র হিসাবে দেখা হয়। যে সমস্ত পুরাণ ও দর্শন সম্প্রদায় ত্রিবর্গ স্বীকার করেন তাদের অনেকের কাছে কাম ও অর্থই শ্রেয় আবার অনেকের মতে ধর্মই একমাত্র শ্রেয়। ত্রিবর্গ প্রসঙ্গে মনু বলেছেন— কেউ ধর্ম ও অর্থকে শ্রেয় বলেন। কেউ আবার কেবল ধর্ম বা কেবল অর্থকে শ্রেয় বলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত হল প্রকৃতপক্ষে ত্রিবর্গই শ্রেয়–

"ধর্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থো ধর্ম এব চ।
অর্থ' এবেহ বা শ্রেয় স্ত্রিবর্গ' ইতি তু স্থিতিঃ"।।[2]

যারা চতুর্বর্গ পুরুষার্থে বিশ্বাসী তারা মোক্ষলাভকেই পরম পুরুষার্থ বলেন এবং এদের মতে

মোক্ষ স্বরূপত কাম্য। তারা বলেন ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষের অভিমুখী হলে তবেই মূল্যবান বলে গণ্য হয়। তাই তারা গৌণ অর্থে মানুষের ইপ্সিত। যেমন– বেদান্ত পরিভাষায় চতুর্বর্গ পুরুষার্থ স্বীকার করা হয়েছে এবং মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে—

"ইহ খলু ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যেযু চর্তুবিধা
পুরুষার্থেযু মোক্ষ এব পরমপুরুষার্থ"[3]

ভারতীয় দর্শনের এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার ক্ষুদ্র প্রয়াস বর্তমান প্রবন্ধের মাধ্যমে করা হয়েছে।

॥ ১॥

ভারতীয় ধর্মনীতিতে পুরুষার্থরূপে 'ধর্ম'কে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ জীবনের কোন প্রার্থনাই পূর্ণ হবে না যদি ধর্মকে পরিত্যাগ করা হয়। 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন' প্রত্যয় যোগ করে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ। যা ধারণ করে তাই ধর্ম। বৈদিক সাহিত্যে 'ধর্ম' শব্দটি নির্দিষ্ট কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 'ধর্ম' শব্দের সমার্থক ইংরেজি শব্দ কোনটি সেটাও বলা কঠিন। পুরুষার্থের প্রেক্ষিতে ধর্মের একাধিক অর্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'কর্ম' বা 'ব্যবহার' অর্থে ধর্মের প্রয়োগ— যা সমাজে মানুষের 'কর্তব্য'কে বোঝায়। কর্তব্য অর্থে কেবল নৈতিক কর্তব্য নয় তার একটি সামাজিক দিক রয়েছে। সমাজে বসবাস করে নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য কর্ম সাধনই মানুষের ধর্ম, যা মানুষের আশ্রম ও বর্ণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ধর্মকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়— সাধারণ ধর্ম ও বিশেষ ধর্ম। প্রথম শ্রেণীর ধর্ম সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের আচরণীয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম মানুষের সামাজিক অবস্থান সাপেক্ষ। মনুসংহিতায় মানুষের বিভিন্ন সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন— ধৃতি বা স্থিরসংকল্পসহ কর্মসাধন, ক্ষমা বা মার্জনা, দম বা মনঃসংযোগ, অস্তেয় বা চৌর্যাভাব, শৌচ বা শুচিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা ইন্দ্রিয় -আসক্তি দমন, ধী বা জ্ঞান, বিদ্যা বা অধ্যয়ন, সত্য বা সত্যবাদিতা ও অক্রোধ বা ক্রোধ বর্জন। এইসব সাধারন ধর্মগুলি সব বর্ণের সব মানুষের এবং সব পর্যায়ের বা আশ্রমের সব মানুষের পালনীয় কর্ম। অন্যদিকে বিশেষ ধর্মগুলি মানুষের সার্বজনীন কর্তব্য নয়। বিশেষ বিশেষ মানুষের স্বভাব, সামাজিক অবস্থান এবং জীবনের নানা পর্যায় ভেদে বিশেষ ধর্মগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই বিশেষ ধর্মগুলি দুই প্রকার। যথা- ক) আশ্রম ধর্ম অর্থাৎ বিভিন্ন আশ্রমের উপযোগী ধর্ম এবং খ) বর্ণ ধর্ম অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী কর্তব্যসমূহ।

মনুস্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে 'আশ্রম' শব্দটি জীবনযাপন প্রণালীকে বোঝায়। মূলত চারটি আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারটি মনুষ্যজীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়। যে পর্যায় ভেদে মানুষের কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন– ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ব্যক্তির কর্তব্য হল গুরুর আশ্রমে গুরুর সাথে বসবাস করা, জ্ঞান অর্জন করা, কামদমন করা, ভিক্ষা করা ও পরবর্তী জীবনের জন্য উপার্জনের শিক্ষা লাভ করা। গার্হস্থ্য আশ্রমে বিবাহিত গৃহীর কর্তব্য হল– সন্তান জন্ম দেওয়া ও লালন পালন করা, পরিবার বজায় রাখা, সন্তানদের শিক্ষিত করা ও যজ্ঞ নিষ্পন্ন করা প্রভৃতি। বানপ্রস্থ আশ্রমে ব্যক্তির কর্তব্য হল— ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করে নিরাসক্তভাবে জীবন যাপন করা, কামবর্জন করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পরিবারের দায়িত্ব হস্তান্তর করা। সন্ন্যাস আশ্রমে ব্যক্তির কর্তব্য হল— বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের মাধ্যমে ও বেদ-উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করে অন্তরের মধ্যে আত্মা বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা।

অন্যদিকে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানগত ধর্মের মধ্যে একটির নাম 'বর্ণধর্ম'। বর্ণধর্ম হল মানুষের বর্ণ অনুসারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণ অনুসারে কর্তব্যকর্ম। এই চারটি বর্ণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের তারতম্যের ভিত্তিতে কল্পিত হয়েছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে তিনটে গুণ থাকলেও প্রত্যেকের মধ্যে একটি গুণ প্রধান হয় এবং ওপর দুটি গুণ অপ্রধান

হয়। কোন মানুষ সত্ত্ব প্রধান, কোন মানুষ রজঃপ্রধান এবং কোন মানুষ তমঃপ্রধান হয়। সত্ত্ব গুণ প্রধান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত। সত্ত্বপ্রধান হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য হল— প্রজ্ঞা, উদারতা, সত্যকথন, নির্লোভ ও সরলতা এবং তার পালনীয় কর্তব্য হল— যজ্ঞানুষ্ঠান, পূর্জাচনা, দানগ্রহণ ও অধ্যাপনা প্রভৃতি। সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত। রজঃপ্রধান হওয়ার জন্য ক্ষত্রিয়ের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য হল— শৌর্য, বীর্য, দম্ভ ও অহংকার এবং তার পালনীয় ধর্ম হল— প্রজাপালন, অসাধুনিগ্রহ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করা প্রভৃতি। তমঃমিশ্রিত রজঃপ্রধান ব্যক্তি হলেন বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। রজঃ-তমঃ মিশ্রিত হওয়ায় বৈশ্যের পালনীয় ধর্ম হল— বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, পশুপালন ও উৎপাদন প্রভৃতি। রজঃমিশ্রিত তমঃপ্রধান ব্যক্তি শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত। তমঃপ্রধান হওয়ার জন্য আলস্য, মূঢ়তা ও পরনির্ভরতা ইত্যাদি শূদ্রের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য এবং এদের পালনীয় ধর্ম হল— অপর তিন বর্ণের মানুষের সেবা ও পরিচর্যা করা এবং আচার অনুষ্ঠানে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ না করা।

॥ ২ ॥

ধর্ম লাভ কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার একমাত্র প্রয়োজনীয় সম্পদ নয়। ধর্ম ছাড়াও জীবনকে যাপনযোগ্য করার জন্য অর্থের যে প্রয়োজন আছে, এ কথা ভারতীয় ধর্মনীতিতে অস্বীকার করা হয়নি। 'অর্থ'কে পুরুষার্থরূপে গণ্য করে ভারতীয় ধর্মনীতিতে এটা বলা হয়েছে যে, ব্যক্তির প্রয়োজনে, সামাজিক কর্তব্য ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে এবং ধর্মপালনের জন্য অর্থ প্রয়োজন। বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন— খালি পেটে ধর্ম হয় না।

মহাভারতের শান্তি পর্বে অর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অর্জুন সিদ্ধান্ত করেছেন– পর্বত থেকে যেমন অনেক নদীধারা বেরিয়ে আসে তেমনই নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা, ক্রমে বেড়ে ওঠা সঞ্চিত অর্থ থেকেই সমস্ত কাজ করা যায়। এই অর্থ থেকেই ধর্ম, কাম, স্বর্গ এবং এই অর্থ থেকেই মানুষের জীবনযাত্রার কাজ নির্বাহিত হয়।[4] জীবনে অর্থের গুরুত্ব বিষয়ে অর্জুন আরও বলেছেন— গ্রীষ্মকালের ক্রমশীর্ণ নদীগুলি যেমন এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনই অর্থহীন অল্পবুদ্ধি মানুষের সমস্ত কাজই খাপছাড়া হয়ে যায়– বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বাঃ গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা।[5]

এখন প্রশ্ন হল এই অর্থ লাভের উপায় কি? মহাভারতে বলা হয়েছে যে উত্থানশক্তির সাহায্যে অর্থাৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অর্থ লাভ হয়। কৌটিল্য পরিষ্কারভাবে তাঁর অর্থশাস্ত্রে একথা সমর্থন করে জানিয়েছেন যে, 'অর্থ' নামে যে পুরুষার্থটি আছে, তার মূল উৎস হল উত্থান— 'অর্থস্য মূলম উত্থানম্'।[6] চেষ্টা, নিরন্তর চেষ্টাই হল উত্থান। এই উত্থান বা প্রচেষ্টার উৎস হল ব্যক্তির শারীরিক দক্ষতা। এই শাস্ত্রগুলিতে বলা হয় যে, দৈহিক ক্ষমতা বা পটুতার চেয়ে বড় কিছুই নয়। কৃষিকার্য, গোরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে ব্যক্তির দক্ষতা প্রকাশের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি হয়। বাৎসায়নও বলেন, অর্থ উপার্জনের জন্য অবলম্বনীয় উপায় ব্যক্তির সামর্থের উপর নির্ভর করে। তিনি অর্থ সংগ্রহের চারটি উপায়ের উল্লেখ করেন— প্রথমত, প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ করে গৃহস্থ জীবনে যাগ-যজ্ঞ করে দান স্বরূপ অর্থ লাভ করেন। দ্বিতীয়ত, জয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে অর্থ উপার্জন করেন। তৃতীয়ত, ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ বৈশ্য বা বনিকগণ ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন। চতুর্থত, নির্বেশ কাজ করে অর্থাৎ শূদ্ররা কায়িকশ্রমের পরিবর্তে যে অর্থ লাভ করেন।

তবে অর্থ কাম্যবস্তু হলেও অর্থ বলতে এমন কোন সম্পদকে বোঝানো হয় না যা অন্যায় ভাবে সংগৃহীত। অন্যায়ভাবে যখন অর্থ উপায় করা হয় তাকে 'অর্থদূষণ' বলা হয়। চুরি করে, শোষণ করে বা অসৎ পথে অর্থ উপার্জন ও নিজের সুখসম্ভোগে ও কামসাধনে ব্যয়িত অর্থ কখনোই পুরুষার্থ নয়। অর্থ সৎ উপায়ে উপার্জন করতে হবে এবং সৎ পথে অর্থকে ব্যয় করতে হবে। সুতরাং সৎ পথে উপার্জিত ও সঞ্চিত অর্থ যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি প্রতারিত হয়নি সেই ন্যায়লব্ধ অর্থই প্রকৃত অর্থ।

বহু শাস্ত্রে অর্থের সংযত ব্যবহারের জন্য ধর্মের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। ভারতীয় ধর্মনীতিতে অর্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও, অর্থের ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বহু স্থানে আলোচিত হয়েছে। ধর্ম কেবল কামের নিয়ন্ত্রক নয়, অর্থেরও নিয়ন্ত্রক। অর্থকে লক্ষ্য রূপে বিবেচনা না করে বৃহৎ লক্ষ্য সাধনের উপায়রূপে গণ্য করতে হবে। অর্থের অপব্যবহার রোধ ও ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যবহারই মোক্ষের অভিমুখে নিয়ে যায় এবং ভারতীয় ধর্মনীতি অনুসারে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভের যা সহায়ক হয় তাই কেবল পুরুষার্থ রূপে গ্রাহ্য হতে পারে।

॥ ৩ ॥

বৈদিক জীবনবাদে মানব প্রকৃতির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে। পশুর মত মানুষের জীবনেও সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ আছে এবং মানুষও ওইসব প্রবৃত্তিকে কোন না কোন ভাবে পরিতৃপ্ত করতে চায়। সহজাত প্রবৃত্তিগুলির তৃপ্ত না হলে মানুষের জীবনে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। বাস্তবমুখী ভারতীয় শাস্ত্রগুলিতে, মানুষের জীবনে দৈহিক সুখসম্ভোগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়নি এবং কামের পরিচর্যার জন্য, দাম্পত্যরতির জন্য, গার্হস্থ্য আশ্রমের উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে বলা হয়— যদি আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের মধ্যে কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করা অসম্ভব। তাই সাধারণ জীবনযাত্রায় কাম বা সুখ ভোগকে অস্বীকার করা যায় না।

'কাম' শব্দটির সাধারণ অর্থ কামনা বা বাসনা। কামসূত্রে বলা হয়েছে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের (কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা) নিজ নিজ বিষয়ে অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ প্রভৃতি বিষয়ে সম্বন্ধযুক্ত হলে আত্মার যে সুখানুভূতি হয় পরে সেই সুখলাভের ইচ্ছা ও তার সাধন বিষয়েও ইচ্ছা হয়, তাকেই কাম বলা হয়।[7] কামসূত্র অনুসারে কাম দু'প্রকারের হয়— ক) কাম্য বস্তুর উপভোগ এবং খ) রমনী ও পুরুষের মিলন সুখ।

ধর্মশাস্ত্রগুলিতে গৃহস্থ জীবনে প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের প্রস্তুতির জন্য যেমন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়, তেমনি ব্রহ্মচর্যের পরবর্তী গার্হস্থ্য আশ্রমে পুরুষার্থ রূপে কামের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়ে থাকে। সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে বংশরক্ষা ও সর্বোপরি মানবজাতির রক্ষার জন্য কাম প্রয়োজনীয়। তবে ভারতীয় দর্শনে সংযত, সীমিত ও পরিশীলিত কাম সমর্থন করা হয়। কামসূত্রে অসংযত ও অপরিমিত বিশৃঙ্খল কামের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে। অর্থের ক্ষেত্রে যেমন ধর্ম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেয়, সেই রকম কামের ক্ষেত্রেও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত আবশ্যক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও কামকে রাজার কাম্যবিষয় রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও ধর্ম ও অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাম চরিতার্থ করার কথা বলা হয়েছে— ধর্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত। ন নিঃসুখঃ স্যাৎ।[8]

মহাভারতে ধর্ম, অর্থ ও কামের সুসংহত সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে– "ধর্ম ও অর্থ উপার্জন না করিয়া যে ব্যক্তি সতত কামপ্রাপ্তিতে ইচ্ছুক, তাহার মিত্রগণ তাহাকে ত্যাগ করেন এবং ধর্ম ও অর্থও সে লাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাহার ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না। জলাশয়ের জল শুকাইয়া গেলে মাছের মৃত্যু যেরূপ নিশ্চিত, কামে উন্মত্ত ধর্মার্থহীন ব্যক্তিরও সেইরূপ কামান্তে নিধন নিশ্চিত"।[9]

প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষার্থের ন্যায় কামও স্বতঃমূল্যবান নয়, তা পরতঃমূল্যবান কারণ শাস্ত্র নির্দিষ্ট ও ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাম মানবজাতির সার্বিক বিকাশে সহায়ক এবং মোক্ষ লাভের উপায় হিসাবে মূল্যবান।

॥ ৪ ॥

'মোক্ষ' শব্দটি 'মুচ্' ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হল মুক্তি। বেদে উল্লেখিত আছে মুক্তির অর্থ মৃত্যুরূপ বন্ধন হতে মুক্তি, কামনা হতে মুক্তি, বন্ধন হতে মুক্তি। আবার গীতায় পাপ হতে মুক্তি, কর্ম বন্ধন হতে মুক্তি, জড়ামরণ হতে মুক্তির উল্লেখ আছে। মহাভারতে বাসনার

নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলা হয়েছে। পুরুষের মুক্তি বা মোক্ষলাভ হলে বন্ধন ছিল বলে ধরে নিতে হবে। বন্ধন না থাকলে মুক্তির কোন অর্থই হয় না। এই বন্ধন হতে নিষ্কৃতির নামই মোক্ষ।

চতুবর্গের অন্তর্গত চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। কারণ ভারতীয় শাস্ত্রমতে সকাম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বর্গ সুখ পরম পুরুষার্থ নয়, বরং যা প্রাপ্ত হলে অতিরিক্ত কিছু কামনা করার থাকে না, সমস্ত প্রয়োজনের অবসান ঘটে তাই পরম পুরুষার্থ। মোক্ষ লাভের পর পুরুষের আর কিছুই কামনার থাকে না। ধর্ম, অর্থ ও কামের পরিচর্যাও পুরুষ করে থাকে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্যই। অর্থাৎ পুরুষের জীবনের লক্ষ্য হল মোক্ষ লাভ করা এবং বাকি তিনটি পুরুষার্থ হল ওই লক্ষ্যের উপায়।

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় মোক্ষ শব্দটি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন-মুক্তি, অপবর্গ, কৈবল্য, নির্বাণ, অপবর্গ প্রভৃতি।[10] পুরুষার্থ হিসাবে মোক্ষের অন্তর্ভুক্তি ধর্মের ধারণায় পরিবর্তন সাধন করে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে প্রেয় ও শ্রেয়—এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। 'প্রেয়' হল পরিবার, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সুখদায়ক বস্তু। আর 'শ্রেয়' হল আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। যারা প্রেয়মার্গকে অনুসরণ করে তারা ত্রিবর্গ পুরুষার্থের অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম স্বীকার করেন এবং ধর্মকেই পরম পুরুষার্থরূপে গণ্য করেন। তারা বলেন ধর্মের স্বতঃমূল্য আছে এবং পুরুষের জীবনের লক্ষ্য হল ধর্মকে অনুসরণ করা। কিন্তু যারা শ্রেয়কে প্রেয় অপেক্ষা বেশি কাম্য বলে মনে করেন, তারা ত্রিবর্গের পরিবর্তে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ স্বীকার করেন এবং এদের মতে মোক্ষ হল পরম পুরুষার্থ বাকি ধর্ম, অর্থ ও কাম হল গৌণ পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ ও কাম হল মোক্ষ লাভের উপায়। মোক্ষ হল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে ধর্ম, অর্থ ও কামের যথাযথ অনুশীলন প্রয়োজন। আসলে ধর্ম, অর্থ ও কাম মোক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ত্রিবর্গের আদর্শ তাই মোক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে না, বরং তা পূর্ণতর হয়ে ওঠে।

মোক্ষবাদীরা মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করলেও মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- বৌদ্ধ দর্শনে মোক্ষ বলতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকে বোঝায়। জৈন মতে, সর্ব আবরণ থেকে বিমুক্তি হল মুক্তি। জৈন মতানুসারে মোক্ষ হল আত্মার এক অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত মুক্তি ও অনন্ত আনন্দময় অবস্থা। সাংখ্য ও যোগ দর্শনে পুরুষের বা আত্মার চিৎ স্বরূপে অবস্থানকেই মোক্ষ বলা হয়। ন্যায় মতে, মিথ্যাজ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই হল মোক্ষ। ন্যায়মতের সমান্তরাল মত বৈশেষিকদের। বৈশেষিকরা বলেন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে গুনশূন্য হয়ে আত্মার স্বরূপ অবস্থিতি হল মোক্ষ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে, সর্বদুঃখের আত্মান্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দাত্মক ব্রহ্মসরূপিতা প্রাপ্তিরই নাম মোক্ষ। মোক্ষ এক লোকোত্তর আনন্দস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ অবস্থা। বিশিষ্টদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে কর্ম সমুচ্চিত জ্ঞান থেকে মুক্তি হয়। রামানুজ পাঁচ প্রকার মুক্তির উল্লেখ করেছেন—

১) সালোক্য— ঈশ্বরের সাথে এক ধামে বা লোকে অবস্থান করে।

২) সামীপ্য— ঈশ্বরের সমীপে অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান করা।

৩) সারূপ্য— ঈশ্বরের যে রূপধ্যান করা হয় সেই রূপ লাভ করা।

৪) সার্ষ্টি— ঈশ্বরের মত অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা লাভ করা।

৫) সাযুজ্য— ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিন্ন হওয়া।

মোক্ষ জীবিত অবস্থায় হতে পারে আবার জীবনাবসানেও হতে পারে। দেহযুক্ত আত্মার মুক্তিকে জীবন্মুক্তি বলে। জীবের জীবিত অবস্থাতেই এই মুক্তি সম্ভব। আর দেহহীন আত্মার মুক্তিকে বা মৃত্যুর পর দেহত্যাগের মাধ্যমে যে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় তা বিদেহমুক্তি। জৈন, বৌদ্ধ ও সাংখ্য-যোগ মতে জীবদ্দশাতেই মোক্ষ লাভ সম্ভব, যদিও বিদেহমুক্তিই যথার্থ অর্থে মুক্তি বা মোক্ষ। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে জীবন্মুক্তি স্বীকার করা হয় না, কেবল বিদেহমুক্তিই স্বীকৃত। অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে জীবমুক্তি ও বিদেহ মুক্তি এই উভয়বিধ মুক্তিই স্বীকার হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে

পরম পুরুষার্থের স্বরূপ কিরূপে গৃহীত হয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ সে বিষয়ে এ প্রবন্ধে গভীর অনুসন্ধান করা হল না।

সর্বশেষে এ কথা সিদ্ধান্ত করা যায়, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ পুরুষার্থের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সময়েও অস্বীকার করা যায় না। আজকের পৃথিবীতে মানুষ কেবল নিজের কাম চরিতার্থ করতে অর্থের পেছনে ছুটছে। নৈতিকতা লোপ পেতে পেতে একপ্রকার তলানিতে এসে ঠেকেছে। সারা বিশ্বে ধর্ম এক অস্থির ও সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, চারিদিকে এক বিশৃঙ্খল হিংসাত্মক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আধুনিক মানুষকে পুরুষার্থের সঠিক পাঠ প্রদান করা, তবেই মানুষের মুক্তি সম্ভব। আর এটাই প্রমাণ করে পুরুষার্থের আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

Endnotes

1. ভারতীয় দর্শন কোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, সাংখ্য-পাতঞ্জল-দর্শন।
2. মনুসংহিতা, ২.২২৪।
3. বেদান্ত পরিভাষা, পৃষ্ঠা- ৪।
4. মহাভারত, ১২.৮.১৬-১৭।
5. মহাভারত, ১২.৮.১৮।
6. অর্থশাস্ত্র, বসাক, ১.১৯ শ্লোক।
7. বাৎসায়ন, কামসূত্র, ১ম অধি, ২য় অধ্যায়, ১১ নং সূত্র।
8. অর্থশাস্ত্র, বসাক, পৃষ্ঠা- ৯।
9. মহাভারতে চতুর্বর্গ, সুখময় ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৯।
10. অমরকোষ, ১.৫.৬-৭।

Bibliography

- মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, তুলি কলম, কলকাতা, ২০০১।
- বাৎস্যায়নের কামসূত্র, বঙ্গানুবাদ গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৩১৩।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১।
- দাস, ডঃ দেবব্রত, ভারতীয় দর্শনের জীবন্মুক্তি ও তাহার দার্শনিক তাৎপর্য, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪০৬।
- চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পা.), ভারতীয় ধর্মনীতি, সেন্টার অফ অ্যাডভান্স স্টাডি ইন্ ফিলোসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৫।
- দাস, চন্দনা, ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে মুক্তির স্বরূপ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫।
- Chatterjee, Satischandra, and Datta, Dhirendra Mohan, An Introduction to Indian Philosophy, Calcuta University Press, Kolkata, 1939.
- Hiriyanna, M, Outlines of Indian Philosophy, George Allen and Unwin Ltd, London, 1932.
- Radhakrishnan, Sarvepalli, Indian Philosophy, Volume -1, Oxford University Press, Oxford, 1923.
- Sinha, Jadunath, Indian Philosophy, Volume 1, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1978.

———